বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

বিষয়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে ' সমাজ চেতনা'

গবেষনাধর্মী প্রকল্প

বিভাগ- বি.এ.জেনারেল

পেপার- SEC-4

নাম- দীনেশ প্রামানিক

শ্রেণি - তৃতীয় বর্ষ (ষষ্ঠ সেমিস্টার)

রেজি. নং- ১১৬০২৭৯ বর্ষ- ২০২০-২০২১

ক্রমিক সংখ্যা- ১২১৬১১৬-২০১০৮৩

শিক্ষাবর্ষ- ২০২০-২০২৩

Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/02 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that ....**Dinesh Pramanik**.................................

with University Registration no...**1160279** of 2020-2021(session)

a student of Semester-**VI** has successfully completed the project work entitled .... **Rabindranath Thakurer Chotoga'pe Samajchetana**...................

for partial fulfillm..nt of B.A.(H) degree in the academic year 2022-202.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish his every success in life.

Project Supervisor
Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

26/08/2023
Head
Head, Department of Bengali
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরামর্শ সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি আমাদের শিক্ষক পলাশ মল্লিক মহাশয়, বাংলা বিভাগ,ও

কৃতজ্ঞতা জানাই যেসব লেখক ও লেখিকাদের যাঁদের বিভিন্ন পুস্তক ও নথিপত্র আমার প্রকল্পের কাজে সাহায্য করেছে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সেখানকার সহকর্মীদের কাছে যাদের সাহায্যে আমার এই প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহযোগী বন্ধু ও বান্ধবীদের যাদের সাহায্যে আমি এই কাজে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি,

পরিশেষে বলা যায় যে আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও কাজে আসে, তবে এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করে আনন্দিত হব,

নাম— দীপিকা প্রামানিক,
বিভাগ— বি.এ. জেনারেল
স্বাক্ষর— Dipika Pramanik

তাং—

সূচিপত্র

১/ ভূমিকা 3

২/ পোস্টমাস্টার গল্পে গ্রাম ও নগরের দ্বন্দ্ব 4–6

৩/ দেনা পাওনা গল্পে ও হৈমন্তী গল্পে নারী ও সমাজবাস্তবতা 7–10

৪/ অতিথি গল্পে ও বলাই-এ প্রকৃতি ও সমাজের দ্বিচারিতা 11–14

৫/ কাবুলিওয়ালার গল্পে সমাজচিত্র 15–16

৬/ উপসংহার 17

৭/ গ্রন্থপঞ্জি 18

ভূমিকা

প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রথম গল্প "ভিখারিনী" ১৮৭৪ সালে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও "দেনাপাওনা" ১৮৯০ গল্পটিই প্রথম সার্থক ছোটগল্প, সামাজিক জীবন, নারী পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

প্রেমের গল্প হিসেবে 'একরাত্রি,' 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতিবিষয়ক গল্পের মধ্যে অতিথি, বলাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব গল্পে প্রকৃতি প্রেমিক নারী ও বালক চরিত্রগুলি হয়েছে যেন প্রকৃতির সন্তান, সমাজজীবনের সম্পর্কবৈচিত্র্য নিয়ে রচিত গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "পোস্টমাস্টার," "কাবুলিওয়ালা," হৈমন্তী, দেনাপাওনা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম সার্থকভাবে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি পাঠ করলে মনে হয়েছে শেষ হয়েও হইল না শেষ।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে গ্রাম ও নগরের দ্বন্দ্ব

কলিকাতার শিক্ষিত-মার্জিত পোস্টমাস্টারের কাছে পুকুর ডোবা আর জঙ্গলে ঘেরা এ পল্লীপ্রান্তর নিতান্তই মনুষ্যবাস অযোগ্য জলগ্রাম, লেখকের বর্ণনায় তার অবস্থিতি ডাঙায় তোলা অর্ধমৃত মাছের মতো, প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো এ জলগ্রামের সামাজিক পরিবেশটাও তার অনুকূল নয়, কুঠিবাড়ির কর্মচারীরা প্রায় সকলেই মেলামেশার অযোগ্য, একে ঘোর প্রবাস, তায় নিঃসঙ্গতা – দুই এ মিলে পোস্টমাস্টারের অবস্থা খুবই করুণ, মেলামেশার লোক নেই, হাতে তেমন কাজও নেই, তাই পোস্টমাস্টার কবিতা লেখে, নেহাৎই শখের কবি, তরু পল্লবের স্পন্দন আর আকাশের মেঘ নিয়ে সস্তা রোমান্টিকতায় ভরা সে সব কবিতা, জীবন সিরিয়াস নয়, তাই কবিতাতেও সিরিয়াস তেমন কিছু নেই, গণ্ডির বাইরে পা দিতে যেমন ভীত, তার কবিতাও তেমনি সস্তা ভাবুকতার ছাঁচে ঢালা পাড়া ভরা ঝুড়ির মতোই একান্ত সাধারণ,

দিনের শেষে এই কুঠিবাড়ি এই শহরবাসী পোস্টমাস্টারের পক্ষে বিভীষিকাময়ী হয়ে উঠত, তখন তরুপল্লবের কল্পনা কবিতার রোমান্টিকতার পরিবর্তে বয়ে আনত অজানা ভীতির শিহরণ, পুলক নয়, শুধু হৃদকম্পন, ঘরের কোণে একটি ক্ষীণ শিখা প্রদীপ, আলোর চেয়ে অন্ধকারটাই দ্বিগুণ করে তোলে, পোস্টমাস্টার দ্বারের কাছে বসে থাকা রতনকে ডাকতেন তামাক সেজে আনার জন্য, তামাক সাজাটা অবশ্যই ছল, আসলে এই নির্জন সন্ধ্যায়, গা ছমছমে নীরবতায় মানুষ বলতে তার কাছের জন একমাত্র রতনই, তাই গল্প করে ওঠার তাগিদ থাকাতেই এ আহ্বান, সবটাই প্রয়োজন সাপেক্ষ ও স্বার্থমুখী, তামাক খেতে খেতে তিনি রতনের পারিবারিক ইতিহাস জানতে চাইতেন, কিন্তু রতন যেমন ছোট, তার পারিবারিক ইতিহাসও তেমন ছোট, রোজই এক পক্ষের কথা নিয়ে গল্প জমে না, তাই একদিন নিজেরা ঘরের কথাও নিজের মতো বলে যেতেন, শ্রোতা অবশ্যই রতন, কিন্তু এই নিজের মতো কথা বলে যাওয়া একাকিত্বের মানসিক সংলাপ, প্রবাসের নির্জনতায় এই মানসিক সংলাপের মধ্য দিয়ে পোস্টমাস্টার ফিরে যেত তার আবাল্য পরিচিত সমাজের অঙ্গনে, তাই রতন এখানে উপলক্ষ্যমাত্র,

পোস্টমাস্টার অবশ্য ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু তার এই আত্মকেন্দ্রিকতার আবরণ একবারই মাত্র খসে পড়েছে নির্জন দ্বিপ্রহরে তরু পরিবেশে, সেই একবার মাত্রই পোস্টমাস্টার প্রকৃতির লীলাকে হৃদয়ভাবে অনুভব করেছে তার চেতনাময়ী অনুভূতি দিয়ে। প্রকৃতির মাধুর্যকে অনুভব করে সে শহরের মধ্যেই আপন সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে, রৌদ্র স্নিগ্ধ ঘাস ও আবর্জনার গন্ধ সুকোমল তপ্ত বাতাসের সঙ্গে মিশে যখন তার গায়ে বনবিহঙ্গদের মতো লাগছিল, যখন পাখির কণ্ঠে সুরের লালিত্য দিকে দিকে বিগলিত হচ্ছিল, যখন রৌদ্র শুভ্র মেঘমালা আকাশের গায়ে সাঁতার দিচ্ছিল, সেই সময়ে পোস্টমাস্টারেরা নিবিড়ভাবে একজনকে তার মনের মধ্যে তার হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আপনজন করে পেতে চাইছিল, সঙ্গীহীন তার অভিশাপ মোচনের জন্যেই রতনকে পড়াবার দায়িত্ব নিলেন পোস্টমাস্টার। এই দায়িত্ব কেউ তাকে দেয়নি, এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত কিন্তু স্বার্থসম্বন্ধহীন নয়, তবে একথা ঠিক যে ওদের দুজনের মিল ছিল, পোস্টমাস্টারের সব থেকেও কেউ নেই, আর রতন তো বন্ধনহীনা প্রকৃতি কন্যা, রতনের লেখাপড়া আরম্ভ হল, অল্পদিনেই যুক্তাক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন কথাটির মধ্যে রবীন্দ্র কৌতুকী ব্যঞ্জনাময়ী হয়ে উঠেছে। দুজনে সাথীহারা জীবনের মুখ্য প্রক্রিয়াটি এই বাক্যের মধ্যে উচ্ছলমুখর।

এর পরেই পোস্টমাস্টারের দীর্ঘদিনের অসুস্থতা ও রতনের নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন, জননীসুলভ সেবার অধ্যায়। দীর্ঘদিনের রোগভোগের পর পোস্টমাস্টার সুস্থ হয়ে উঠলেন, এবার মনের ভাব ভাবার মতোই প্রবল, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত লিখলেন, দরখাস্ত না মঞ্জুর হতে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার একসপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় তিনি রতনকে জানিয়েও দিলেন, এ জানানোর ব্যাপারটা নিতান্তই বৈষয়িক। রতনকে আগে থাকতে যেন নোটিশ দেওয়া হল। পোস্টমাস্টার মুখ্যকথায় পৌঁছতেই পারেননি, তাই রতন জিজ্ঞাসা করল দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে, পোস্টমাস্টার হেসে বলেছেন সে কি করে হবে, কেন হবে না, বাবা কোথায় — এসব বিশদ করে বলার প্রয়োজন বোধ করেননি।

রতন প্রায় ভেঙে পড়েছে তখনও পোস্টমাস্টার রতনের হৃদয়ের পাঠ করেননি, সান্ত্বনা দেবার ছলে যখন বললেন, রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন, তাকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মত যত্ন করবেন, রতনের ব্যবহার তাকে বিস্মিত করেছে, একটু যত্ন, একটু স্নেহ

ছাড়াও রতনের নারী হৃদয় যে আরও কিছুর আশাপ্রার্থী সে খবরই তার জানা নেই, জানা থাকা সম্ভব নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা ছেড়ে দিলেও নেই, বংশের মর্যাদা সামাজিক বাধাচার বড় বাধা, শহরের শিক্ষিত যুবকের পক্ষে অনাথিনী বালিকা রতনকে অন্য কিছু ভাবলে বা অন্য দৃষ্টিতে দেখলে সেটাই অস্বাভাবিক বা বেমানান হত, পোস্টমাস্টারকে মানুষ হিসাবে অপছন্দ ভাবার কোন কারণ নেই, তিনি অনাথিনী রতনকে স্নেহ করে-ছেন, তাকে যত্ন করেছেন, যতদিন না নতুন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়, ততদিন চলার মত পথখরচা বাদ দিয়ে বেতনের সব অর্থও দিতে চেয়েছেন, রতনকে কলিকাতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেটা বেমানান হত,

তবু রতনের জন্য তার হৃদয় যে ব্যথিত হয়নি তা নয়, নদীবক্ষে পাল তোলা নৌকায় বসে নদীতীরস্থ শ্মশানের হাওয়ায় সত্য দার্শনিকতার মধ্যে সব রকমের পিছুটান ভুলতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে কে কাহার। অনেক ব্যথা অনেক বেদনা মানুষ এইভাবেই ভুলতে চায়, ভুলেও যায়। রত-নের কথা পোস্টমাস্টার একদিন ভুলে যাবে, জীবনের প্রবাহে কত ঘাটের কত পসরা এসে নামবে, এমনি করেই এগিয়ে চলে মানুষের জীবন, এমনি ভাবেই রতনের স্মৃতিকে পাশে ফেলে এগিয়ে যাবে পোস্টমাস্টার,

'দেনা পাওনা' ও 'হৈমন্তী' গল্পে নারী ও সমাজবাস্তবতা

পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি নিদারুণ অভিশাপ, সমাজের একটি নিদারুণ অভিশাপ, সমাজের সবচেয়ে কোমল যে অংশ স্নেহ ভালোবাসায় ভরা, নবজীবন ও যৌবনের স্বপ্নে বিভোর যে তরুণীর মন, তাকে এই নিষ্ঠুর প্রথার যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান দিতে হয়। বিবাহ দুটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের মিলন এবং একই সঙ্গে দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক, কিন্তু পণপ্রথা এইসুখ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নাশ করে দেয়। কোন পর্যন্ত নববধূকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর অতল গহ্বরে, ভালোবাসার হৃদয় বিনিময় টাকাকড়ির দেনা পাওনা- এ পরিণত হয় সভ্য, শিক্ষিত, বিত্তবান বাবুরা অভিভাবকরাও এই কুপ্রথার বশবর্তী হয়ে নববধূর সঙ্গে যে কি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ গল্পটিতে তার বাস্তব ছবি এঁকেছেন, এমন পরিস্থিতিতে স্নেহ ভালোবাসায় মানবিক দাবিকে উপেক্ষা করে আর্থিক বিত্তের দানবিক দাবি বড় হয়ে ওঠে। একান্ত আপনজনকে মর্মান্তিক আঘাত দিতে সে দ্বিধা বোধ করে না, এমনি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমা বাবা মায়ের নয়নমণি। পাঁচ ছেলের পর এই মেয়েকে পেয়ে রাম সুন্দরের আনন্দের শেষ ছিল না, স্নেহে যত্নে একে বড় করেছে রামসুন্দর, বিবাহযোগ্য হলে নিরুপমার যোগ্য পাত্র মিললো, পাত্রের পিতা রায় বাহাদুরের সঙ্গে রামসুন্দরের পাকা কথা হল ১০০০ টাকা পণ, কিন্তু বুদ্ধিহীন আবেগপ্রবণ রামসুন্দর রাজি হয়ে গেল, কিন্তু টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে সে বিপাকে পড়ল। চড়া সুদে সে ধার দিতে রাজি হয়েছিল, বিয়ের দিন পিছিয়ে গেল, পণ নিয়ে বিয়ের আসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো, নগদ টাকা হাতে না পেয়ে রায় বাহাদুর বেঁকে বসলেন, রামসুন্দরের অনুরোধে কান দিলেন না, এই সংকটে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাত্র নিজে পিতার অবাধ্য হয়ে বসলো, পিতার অমতে একরকম স্বেচ্ছায় নিরুপমাকে বিয়ে করল, সবাই বুঝলো এর ফল ভালো হবে না, বিয়ের পর নিরুপমাকে বাবা মায়ের কাছে রেখে তার স্বামী কর্মস্থলে ফিরে গেলেন, এবারের শ্বশুরবাড়ি দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে রামসুন্দর বাইরের ঘরে কোনো দিন মেয়ের দেখা পায়, কোনোদিন হয়তো দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়, পণের ৬-৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি বলে রায় বাহাদুর এই সম্পর্ককে স্বীকার করতে চান না, একবার ধার করে ২-৩ হাজার টাকা দিতে এসে রামসুন্দর বেশ অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছিল, রামসুন্দর বুঝেছে, পুরো টাকা না দেওয়া পর্যন্ত

নিরুপমাকে সে নিজের গৃহে নিয়ে আসার অনুমতি পাবে না, অসহায় মেয়ে হয়ে পিতার মর্মযন্ত্রণা দু-একটি রেখায় লেখক মূর্ত করে তুলেছেন,

এদিকে সুচতুর শাশুড়ি নিরুপমার ওপর নির্মম মানসিক নিপীড়ন করে চলেছেন, নববধূ যেন তাদের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে, শাশুড়ির প্রশ্রয়-প্রাপ্ত বাড়ির দাস-দাসীরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, সকলেরই নিদারুণ উপেক্ষায় ও বিদ্রূপতায় এই বন্দিদশা তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে, সে নিয়মিত আহারাদি করে না, তীব্র মানসিক কষ্টে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমতী শাশুড়ি বধূর অসুস্থতাকে নিছক আহ্লাদেপনা বলে আখ্যা করলেন, সুতরাং নিরুপমা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেও তার চিকিৎসার কোনো প্রশ্ন উঠল না,

শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের এই নির্যাতন রামসুন্দরকে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করে তুলল, মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে রামসুন্দর জোগাড় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল, নিজের বসত বাড়ি বিক্রি উদ্যোগী হল, রামসুন্দরের বড় আশা, এবার অন্তত কিছু দিনের জন্য মেয়েকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারবে, কিন্তু সত্য গোপন থাকলো না, বাড়ি বিক্রির কথা শুনে দাদারা ওকে বাধ সেধে পড়ল, তারা রামসুন্দরকে অনেক বাধা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফল কিছু হল না, সমস্ত পরিবারটিকে নিরাশ্রয় করতে বাধা দিল নিরুপমা, সে স্পষ্ট বলল, সে এই বাড়ির বধূ, টাকার থলি মাত্র নয়, অর্থের বিনিময়ে তার প্রাণের মূল্য নির্ধারিত হতে পারে না, মেয়ের যুক্তির কাছে হার মেনে নিলেন রামসুন্দর, এই সংবাদ গোপন থাকলো না, দাসীদের মারফৎ শাশুড়ির কানে তা পৌঁছে গেল, শুরু হল নিদারুণ উৎপীড়ন, নিরুপমার রোগ বেড়ে চলল, শেষে সত্যিই একদিন রায়বাড়িতে ডাক্তার ডাকা হল, সেই প্রথম এবং সেই শেষ, চিকিৎসার কোনো সুযোগ না দিয়ে নিরুপমার অকাল মৃত্যু ঘটল, পরে অবশ্য রায়বাড়ির যথোচিত মর্যাদা রেখে মহা ধূম-ধামের সঙ্গে এ বাড়ির বধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করা হয়েছিল, জীবিতকে যতই লাঞ্ছনা করা হোক, মৃতের প্রতি অমর্যাদা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মহাপাপ, গল্পের উপসংহার এই ভয়ংকর সমাজ সমস্যার করুণ রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, নিরুপমার স্বামী নতুন সংসার পাতার জন্য স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল, উত্তরে নিরুপমার শাশুড়ি জানিয়েছিল, এবারে কিন্তু হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়, এই শেষ বাক্যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে।

10 9

'হৈমন্তী'

বাংলার ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হৈমন্তী তার এক অনুপম সৃষ্টি, কখনো প্রেম ভালোবাসা, কখনো সমাজের মানুষগুলোর সম্পর্ক খোঁচিত্র, ইত্যাদির সরস বর্ণনায় গল্পকে ফুটিয়ে তোলেন তিনি, হৈমন্তী গল্পে সমাজবাসীদের এমন কিছু চিত্র, মানুষের সম্পর্কগুলোর মধ্যে বর্তমান এমন কিছু বিচ্যুতি সাংকেতিক তুলে ধরেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়; তার আশেপাশের মানুষগুলোর মুখোশ তিনি উন্মোচন করেন।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী, তাকে ঘিরেই গল্পের প্লট নির্মিত, হৈমন্তী, তার বাবা, তার স্বামী, তার শ্বশুরালয়, শ্বশুরালয়ের যাবতীয় ভালো মন্দ তাকে ঘিরেই আবর্তিত, গল্পের বিস্তৃত পরিসরে পাঠক খুঁজে পায়, তৎকালীন হিন্দু সমাজের একটি বিকৃত চেহারা, গল্পটি ওই সমাজের এমন কিছু বিষয় চিত্রিত করেছে, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী এবং যুগে যুগে তার মতো নিষ্কলঙ্ক নারীরা অন্যায় ও নির্মমতার বলি হয়ে আসছে।

শিক্ষিত পিতার একমাত্র কন্যা হৈমন্তী, সে মাতৃহীন, মিথ্যা বলা, প্রতারণা, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া- এসব সে শেখেনি, অন্যের মধ্যেও সে এসব খোঁজে না, দেখতে পায় না, তাই শ্বশুরবাড়িতে বাস্তব জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সে যেন দিশে হারিয়েছে, গল্পের সূচনা তাকে নিয়ে, শেষ ও তাকে দিয়ে, তার বিয়ে, বিয়ের জন্য তাড়া, তার আইবুড়ো বয়স, কবি বন্ধুর কল্পনায় হবু বরের ভেতরে তীব্র ব্যথা, তার হবু শ্বশুরের লোভী অংকের যৌতুক প্রত্যাশা ইত্যাদি কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারেনি সে, অথচ বিয়ের আগে থেকেই হৈমন্তী তা ঘুণাক্ষরেও জানত না, বিয়ের জন্য পাত্র পক্ষের খুব তাড়া ছিলো, তাহার কারণ জানা যায় পাত্রের নিজ জবানিতেই, মেয়ের বয়স অনেক বেড়ে গেছে বলে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া, যাহোক যথা সময় তাড়াতাড়ি হৈমন্তীর বিয়ে হলো, পণের টাকা মিললো, পিতা- কন্যায় বিচ্ছেদ হলো, বর কনের মিলন হলো, কনে সম্পর্কে বরের উচ্ছ্বাসও কোনো ঘাটতি রইলো না, কনে যেন নতুন বরের মনে হলো, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম, অন্যদিকে এক পিতা তার সন্তানকে চিরদিনের জন্য তুলে দিলেন প্রায় অপরিচিত কিছু মানুষের হাতে, এ নিয়ে তার আফসোস দেখা যায়নি, জীবনের এই কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, তাই তিনি নতুন জামাইকে খুব এইটুকুই বললেন, যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পারো, কিন্তু নিজের জন্য রাখলেন শুধু সামান্য এক সম্বলই, যা পৃথিবীর প্রতিটি পিতা মনে মনে প্রার্থনা করেন এবং তা হলো, যাহা দিলাম তাহা প্রসন্ন করো।

দিলাম, এখানে নিরীহ তাকাইতে জেনেও দুঃখ পাইতে হইবে, হৈমন্তীর শ্বশুর বাড়িতে প্রথমে ভালোই কাটে, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্বশুরের ধারণা ছিল, হৈমর বাবার বড় চাকরি, রাজার মন্ত্রী তিনি, সুতরাং পণের টাকা যা দেননি, তা হৈমর বাবার নিজেরই এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে, ছেলের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ কল্পনায় সবকিছু ঠিকঠাক চলে, কিন্তু যখন জানতে পায় যখন তিনি জানাতে পারেননি, পণের যে টাকা তিনি দিয়েছেন সেটি ধার করা, তাছাড়া হৈমন্তীর বাবা একজন সামান্য স্কুল হেডমাস্টার ইত্যাদি, এরপরেও পুত্রবধূ তার শ্বশুরের শিখিয়ে দেওয়া মিথ্যে বলতে পারে না, প্রয়োজনে কপোলকল্পনার আশ্রয় নেয় না, সুতরাং শ্বশুরবাড়ি হৈমন্তীর জন্য ধীরে ধীরে নরকবাস হয়ে ওঠে, চতুর্মুখী নির্যাতনে হৈমন্তীর জীবনে বিষাদ নেমে এলো, সে বর তার হাতের স্পর্শ পেয়ে একদিন পুলক অনুভব করে, রোমাঞ্চিত হয়, তার সুশিক্ষা ও সততায় সে মুগ্ধ, কিন্তু সে তাকে সুরক্ষা দিতে পারে না, হৈমন্তীকে স্বামী অপুর কাছ থেকে শুনতে হয়, দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী যেখানে সমাজ ও ধর্মের কাছে স্ত্রীধর্ম মিথ্যা, স্ত্রীর সতীত্ব মিথ্যা, মা পাত্রী সন্ধান করছেন, হয়তো সেখানেও স্ত্রীগুণে মুগ্ধ, স্বামী না বলতে পারবে না কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের দিয়ে যায়, তা সমাজের মৃত্যুদণ্ড।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু শব্দ, পদ ও বাক্য যোজনায় ব্যক্তি ও সমাজ চরিত্রের যে সমস্ত অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে একটি পরিপূর্ণ সমাজচিত্র এঁকেছিলেন, তার তুলনা হয় না, এখানেই ছোটগল্প, এরই নাম 'হৈমন্তী'।

অতিথি ও বলাই গল্পে প্রকৃতি ও সমাজের দ্বিরালাপ

তারাপদ নামক এক পনেরো ষোলো বছরের বালককে নিয়ে তার জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার সবই বিশেষ দৃষ্টিনন্দন ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য অতিথি গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়, অতিথি গল্পের তারাপদর চোখ দিয়ে আমরা যে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করি তা মূলত লেখকের দৃষ্টি নিয়ে দেখা।

অতিথি গল্পটি মূলত লেখককেন্দ্রিক, গল্পের কাহিনী, চরিত্র সব সমস্তর মূলে বিশেষত তারাপদর স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোনও বন্ধন তারাপদকে বাঁধতে পারেনি - কল্পনাও তারাপদকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে, তাই তো সে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় নিজে নিজেই বয়ে গেছে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিক্রমা করেছে কখনো বিদেশি যাত্রার দলে, কখনো পাঁচালির দলে, কখনো জিমন্যাস্টিকের দলে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে ছিল সঙ্গীত প্রেমী, শুধু তাই নয় গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টি ধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত, বহুদূর আকাশে হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, শৃগালের চিৎকার ধ্বনি সকলই তাকে উতলা করিত, অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রতি আসক্তিবশত বিভিন্ন যাত্রাদলে অংশগ্রহণ করলেও বেশিদিন সেই যাত্রাদল তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি, আসলে চিত্তের অস্থিরতা বশত সে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় দৌড়ে বেড়িয়েছে, এজন্য সংসারের মা দাদার কাছ থেকে কুৎসিত কথা ভোগ করতে হয়েছে, তথাপি সে থেমে থাকেনি, কেউ কখনো তাকে কোনও বাঁধনে বাঁধতে পারেনি।

অতিথি গল্পের বিষয়মনে বারে বারে এসেছে নদীর প্রসঙ্গ, তারাপদর কর্মক্রিয়া চলন বলন সমস্তই যেন নদীর সঙ্গে ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রকৃতি প্রেমের মধ্য দিয়ে সংসারের স্থবির, জড়তা শোক গ্লানি তাপ সমস্তই তার সংসার ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিমুক্ত করে এক সুস্থ সাবলীল মুক্ত জীবনের সন্ধান দেয়, নির্বিকার চিত্তে তারাপদ যখন সমাজ সংসারকে অবহেলা করে প্রকৃতির টানে ছুটে চলে তখন আর যাই হোক এই বন্ধন ছেঁড়ার সাধ্য আছে, সেখানেও কোনো স্থিরতা নেই শুধু চলা আর চলা, জমিদারপত্নী

অন্নপূর্ণার সঙ্গে সামান্য কথোপকথন সেরে প্রকৃতির অপূর্ব শোভা প্রত্যক্ষ করে- বর্ষা নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত আপন আত্মহারা পদ্মার চাঞ্চল্যে প্রকৃতি মাতাকে যেন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, মেঘ নির্মুক্ত রৌদ্র নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশ তৃণশ্রেণী এবং তাহার উপরিভাগে বনরেখা সমস্তই যেন সোনার এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত- নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মধ্যে দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তারাপদ এই স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে আর থাকেনি, প্রকৃতির প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ যেন সাড়া দিয়েছিল।

মতিলাল বাবু যখন তারাপদকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে সম্পূর্ণ তৈরী, চারু যখন মোহিনী মায়ার দ্বারা তারাপদর অন্তরে অনুপ্রবেশের পথ খুঁজছে, জমিদারপত্নী তার স্নেহবশত স্নেহের সূত্র এক মন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে তারাপদকে মনেপ্রাণে পুত্রস্নেহে ভালোবেসে কাছে রেখে দিতে চেয়েছে আসলে ঠিক তখনই তারাপদর অন্তরাত্মার বিদ্রোহ ঘোষণা করে; তাই স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের সুসমৃদ্ধ বন্ধন অস্বীকার করে আসক্তিহীনতায় উদাসীন সন্ন্যাসীর মত পৃথিবীর দিকে চলে গেল, অতিথি গল্পের নায়ক তারাপদর দ্বারা কেবলমাত্র প্রকৃতির আসল স্বরূপ ব্যক্তিত্ব হয়েছে একথা সম্পূর্ণ রূপে বলা যায় না; গল্পের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির কায়া নির্মাণে আছে- রৌদ্র বৃষ্টি বর্ষার আকাশ, নদী স্রোত, নদীতীরবর্তী জনবসতি, ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, অপূর্ব বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তবে প্রকৃতির যে অমোঘ টান তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি চারুশশী মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণার সাংসারিক বন্ধন যখন তিরস্কার করে ওঠে, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ইতিহাসে এই অতিথি গল্পটি এক অনন্য সৃষ্টি তা জগতের আসরে মেনে নিতে হয়।

'বলাই'

প্রকৃতিপ্রেমিক বলাই তার প্রকৃতিতে যেমন করে গাছপালার মূল সুর গুলোই হয়েছে প্রবল, ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ করে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ, পুরোনো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরোনো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প, ওই ড্যাবা- ড্যাবা চোখ মেলে সর্বদা তাকিয়ে থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না, তাই একে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়, কেউ গাছের মূল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে, আর কারও কাছে এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে, এইজন্য ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকি পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দুপাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে, ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে ওর মনে দুঃখ হয়, সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়ুনি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়, তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই, এক একদিন ওর কাকির কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, ওই ঘাসিয়ারাকে বলো না, আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে,

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই ওর চার দিকের লোকের মধ্যে কোনো সাড়া নেই, একদিন সকালে বাগানে এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে বলে গাছটি কী গাছ দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া দাওয়া রাস্তার মাঝ- খানেই পড়েছে, তারপর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকালে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল, তারপর গাছটি একদিন বিঘাত আকৃতির ন্যায় হয়েছিল,

যেদিন এক সময়ে দেখলুম, শিমুল গাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে, এত দূর অসংগত হয়ে পড়েছে যে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, এমন সময়ে

বলাই এর কাকা গাছটি কেটে দেয়, এমনি সময়ে বলাই সিমলে থেকে তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে কাকি, আমার শিমুল গাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও, কাকি বললেন গাছ কাটা হয়ে গেছে, বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলেন; তাতেও ওর স্নেহ সমস্ত অহংকারকে বামল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলো, ঐ গাছ যে ছিল তাঁর প্রতিরূপ তাঁর প্রাণের দোসর।

কাবুলিওয়ালার গল্প সমাজচিত্র

'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মূলভাব হল বাবারা তাদের সন্তানদের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা রাখেন, গল্পে আমরা মুখোমুখি স্নেহের তিনটি দিক হলেন সেক্ষেত্রে বর্ণনাকারী এবং তার মেয়ে মিনি কাবুলিওয়ালা, রহমত এবং আফগানিস্তানে তার নিজের মেয়ে এবং রহমত, কাবুলিওয়ালা এবং

এই গল্পে কাবুলিওয়ালা গল্পটি আদি, মধ্য ও অন্ত্যযুক্ত গল্প হলেও গল্পটি ব্যতিক্রমী, গল্পকথক মিনি ও কাবুলিওয়ালার পরিচয়, তাদের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনকে তুলে ধরেছেন, গল্পে রহমতের কারাগারে অন্তঃরীন হওয়া এবং মিনির বয়ঃবৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবাদই এই অংশের মুখ্য বিষয়, কাবুলিওয়ালার হৃদয়ের অনুভূতি, তার পিতৃস্নেহ দেখতে পাই, কাবুলিওয়ালার শেষ বক্তব্যের প্রকাশ-মূর্চ্ছনা গল্পকথক মিনির বাবাকে প্রভাবিত করেছে, আচার-আচরণ, কৃষ্টি ও সভ্যতার বিশাল পার্থক্য সত্ত্বেও মিনির বাবা রহমতের পিতৃস্নেহের সঙ্গে তার নিজের পিতৃস্নেহের কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি, অশিক্ষিত কাবুলিওয়ালা এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত বাঙালি মিনির পিতা হৃদয়ানুভূতির এক স্বর্ণশিখরে একই আসনে সমাসীন, দেশ ও সভ্যতার পার্থক্য হলেও হৃদয়ানুভূতির মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কাবুলিওয়ালাকে মিনি চিৎকার করে ডাকার মধ্যেই রহমতের অন্তরের পিতৃস্নেহ যেন উথাল হয়ে উঠেছে, কারান্তরের দীর্ঘ আট বছর রহমতের সমস্ত চেতনায় অশেষ আঘাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও, এর একটা তত্ত্বগত দিক আছে, আফগানিস্তানের মরু পর্বতবাসিনী কন্যার মসিলিপ্ত হাতের ছাপ বক্ষে ধারণ করে রহমত কলকাতায় থাকে, মিনির মধ্যে সে আপন কন্যার সাদৃশ্য অনুভব করে মিনিকে সে কন্যার স্নেহে অভিষিক্ত করে, নিজ কন্যার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে তাকে দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের পরিবর্তে কারাগারে আবদ্ধ হতে হয় এবং সেখানে আটটা বছর কেটে যায়, এই আটটা বছর রহমত যেন কারান্তরে কন্যার হস্ত ছাপটিকে নিয়ে কন্যার চিন্তায় মগ্ন থেকেছে, বারংবার সেই ছাপ দেখা এবং দেখে থেকে বিদায়ের সময়ে কন্যার সেই ছোট্ট অবয়বখানি তার মনের মধ্যে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছে,

বধূবেশী মিনিকে দেখার পরেই তার জাগ্রত সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, তার নিজের কন্যাটিও যে এত বড়ই হয়েছে, সে আর পূর্বের মতো

চোখ নেই, পুনরায় নতুন করে তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, রহমত বাস্তবে ফিরে এসেছে,

রহমতের পিতৃসত্তার কারণে মিনির পিতার পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়েছে, মিনির পিতা অশিক্ষিত এই কাবুলিওয়ালার পিতৃসত্তার সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েছে, কাবুলিওয়ালা রহমতের পিতৃহৃদয় যেন মিনির মতোই জগতের মূল ভাবসত্যকে জাগরিত করেছে,

উপসংহার

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠতম শাখা, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্পে বয়স অনেক কম হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর অতুলনীয় সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য ও প্রসার ঘটেছে, লেখক তার মনের ভাব ভঙ্গীর ব্যঞ্জনার সহযোগে সাহিত্য রূপদান করেছেন, বর্তমান সময়ের প্রায় সব লেখকই বাস্তববাদী ও সমাজ সচেতন,

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে কালানুক্রম ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়-

প্রথম পর্ব- হিতবাদী সাধনার যুগ

দ্বিতীয় পর্ব- ভারতী সবুজপত্র পত্রিকার যুগ

তৃতীয় পর্ব- তিনসঙ্গীর যুগ

প্রথম পর্ব:- এই পর্বে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' 'অতিথি' গল্পের তারাপদকে যেমন জল্প পথিক করে গড়ে তুলেছেন, তেমনি রহমত কাবুলিওয়ালার রুক্ষ চেহারার অন্তরালে বাৎসল্যের ফল্গুধারাকে উচ্ছ্বসিত করে দিয়েছেন,

পদ্মাতীরে বসবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকার আমন্ত্রণে ছয় সপ্তাহে যে ছয়টি ছোটগল্প লেখেন সেগুলি হল- 'দেনা পাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' এবং তারা প্রসন্নের কীর্তি, এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বেশিদিন থাকেনি কিন্তু এই পত্রিকার সূত্রে তাঁর সর্বোচ্চ ছোটগল্প রচনায় যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তা অব্যাহত ছিল শেষজীবন পর্যন্ত, হিতবাদীর পরে 'সাধনা' পত্রিকায় খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সমাপ্তি সমাপন, প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, এই 'হিতবাদী-সাধনা' পর্বের গল্পগুলিতে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে,

দ্বিতীয় পর্ব:- রবীন্দ্র ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বে 'ভারতী এবং সবুজপত্র' নামের পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল্প প্রকাশিত হয় দুরাশা, মণিহারা, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী প্রভৃতি গল্প এই পর্বের অন্তর্গত,

তৃতীয় পর্ব:- রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার শেষ পর্ব তিনসঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি হল রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি,

আকর গ্রন্থ:- গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংকলন,